আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত

রুদ্রেন্দু চক্রবর্তী

বাংলা তথা ভারতবর্ষ যখন এক যুগসন্ধিক্ষণের আলো - আধাঁরিতে নিমগ্ন কলকাতার রাস্তায় কলের জল গোঁড়াপন্থীদের কাছে অপবিত্র, নব্যায়নপন্থী মানুষ তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে। মূলত ব্রাহ্মধর্মাবল্মী যুবকবৃন্দ সমাজের নানা কুসংস্কার জাতিভেদ প্রথার অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইংরেজী-গণিত বিজানকে স্বাগত জানিয়ে নবজাগরণের দ্বারকে উন্মোচন করেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছেন। সনাতনপন্থী আর নব্যায়নের এই ভাব সংঘর্ষের কালেই আচার্যপ্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষা সংস্কৃতি পূর্ণ বাঙালির এক জমিদার বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহ মানিকলাল রায় এবং পিতামহ আনন্দ লাল রায় যথাক্রমে দেওয়ান এবং সেরেস্তাদারের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং জমিদারি গড়ে প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র রায়, নামে হিন্দু, মৌলবীর কাছে পার্সী শেখেন, হাফিজের দেওয়ানা তাঁর মানসিক জগতে প্রভাব ফেলে এবং তিনি রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র হয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশুনা করেন। তিনি সংগীতবিদ্যায় অনুরাগী ইংরাজী সহ বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী— নানা পত্রিকার তিনি পাঠক এবং বাড়িতে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারেরও অধিকারী। তাঁর পিতাই বলতে গেলে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তিনি 'নব্যবাংলার' ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ার উদার ভাবধারায় লালিতপালিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কোন ক্ষণে ইতিহাস ইংরেজী সাহিত্য আত্মচরিত অধ্যয়নে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং চরিত্রগঠনে, জীবনের স্বপ্নকল্পনা পরিকল্পনায় যা সুদূরপ্রভাব বিস্তার করে। আমরা লক্ষ্য করি সারা জীবনে তিনি যেমন পৃথিবীর নানা ধ্রুপদী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস, জীবনচরিত পাঠ করে তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তুলেছেন, তেমনি তিনি তার ভাবনা বা কাজের বা ইতিহাস, অর্থনীতি সামাজিক যে কোন বিষয়েরই মূল্যায়ন করে মতামত জানিয়েছেন, তা করেছেন কোন না কোন বিষয়ের বইয়ের লেখকের, দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের বক্তব্য তুলে ধরে। ভাবলে অবাক হতে হয় এতবড় বিজ্ঞানী, নানা সাংগঠনিক ব্যবসায়িক কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েও কিভাবে তিনি কত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন কত কিছু।

তাঁর পিতা অর্থনীতির মুলসূত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই অর্থকে লগ্নী কারবারে নিয়োজিত করে তিনি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পারিবারিক সূত্রে শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে বৈষয়িক ধনবৃদ্ধি ব্যবসায়িক গুণটিও পেয়েছিলেন— যদিও তা নিজের জন্য নয় দেশের মঙ্গলের জন্য তা আমরা পরে দেখব। আত্মচরিতে যেমন তিনি বলেছেন, 'আমি যুবকদের নিকট বক্তৃতায় অনেকবার বলিয়াছি যে আমি ভুলক্রমে রাসায়নিক হইয়াছিলাম। ইতিহাস, জীবনচরিত, সাহিত্য এইসব দিকেই আমার বেশী ঝোঁক।' না তিনি ভুলক্রমে রাসায়নিক হননি। তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। রাসায়নিক হয়ে বিশ্বযুদ্ধে যখন ইংলন্ডের অস্ত্রনির্মাণে নাইট্রিক অ্যাসিডের দরকার তা তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে যোগান দিয়েছেন। আর গোখেলের ভাষায় 'বৈজ্ঞানিক সন্নাসীতো' নিজের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের জন্য করেননি, তিনি এই কারখানা শুরু করেছিলেন মাত্র ৮০০ টাকার মূলধন নিয়ে মনের জোরে। বিজ্ঞানের অধীত বিদ্যাকে দেশের শিল্প প্রসারের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কিছু চাকরী দেবার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস একটি ভেষজ বা ঔষধ তৈরীর কারখানা যাতে রাসায়নিক পদার্থও তৈরী হবে। এটি করতে সহায়তা পান তার সতীর্থ অমৃতলাল বসুর যিনি ওষুধ বিক্রিতে ডাক্তারবাবুদের সহায়তা পেতে সাহায্য করেন। প্রফুল্লচন্দ্র সোদপুরে এসিড তৈরির কারখানা করেন। এ বাদেও তিনি কলকাতা পটারী ওয়ার্ক, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেড, স্ট্রীম নেভিগেশন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঙালী যুবকদের মেধা কল্পনাশক্তি, অন্তরের উদারতা, দেশানুরাগ অনেক কিছু থাকলেও তারা অলস, কায়িক পরিশ্রমে অনীহ, তাছাড়া সামাজিক কুসংস্কারের জন্য কায়িক শ্রম থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দূরে— ব্যবসাবাণিজ্য তাতেও তাদের আসক্তি নেই। সবাই উচ্চশিক্ষা অর্জন করে অফিস আদালতে চাকরী করতে প্রত্যাশী। কিন্তু সেখানে ব্যবসা করলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আয় করতে পারে। আর উচ্চশিক্ষা তো সবার জন্য নয়— কিছু পড়াশুনা করে নানাবৃত্তিমূলক বিদ্যার দিকে যদি তারা এগোয় তবে স্বল্পশিক্ষিত যুবকরাও নানা ধরনের কাজ পেতে পারে। তাই তিনি বারেবারে বলেছেন 'গত ৪০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর এই অন্ন সমস্যার কথা আমি চিন্তা করিয়াছি এবং সশঙ্কচিত্তে দেখিতেছি যে, বাঙালি আজ 'নিজ বাসভূমে' জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই সব কথা লিখিবার সময় আমি বাংলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেছি এবং বাঙলার বালক ও যুবকদের কার্যকলাপ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছি। জোতিঃহীন চক্ষু, অনাহারক্লিষ্ট— তারই পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহার মুখে একটা অসহায় ভাব। পরাজয়ের গ্লানি যেন তাহার সমগ্র চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে।...যে জাতির যুবশক্তি এইভাবে নৈরাশ্য পীড়িত ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহাদের ভবিষ্যতের আশা থাকে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার জীবনসায়াহ্নে আমি একেবারে আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।বাঙালীর এই যে নিজ বাসভূমে জীবনসংগ্রামের কারণ তারও ইতিহাস তুলে ধরেছেন তিনি। ১৮৬০ সালের পর থেকে যখন জমিদাররা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে শুরু করল এবং যে জমিদারদের উত্তরসূরী ' রূপোর চামচ' মুখে দিয়ে জন্মে বিলাসব্যসন, অলসতায় দিন যাপন করতে লাগল—আর্থিক উন্নতির চিন্তা রহিত ব্যবসায় বিমুখতা, নানা উদ্যমহীনতা গ্রাস করল— তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পদ একে এক মাড়োয়ারী,

ভাটিয়া এরা কিনে নিল। কিছুকালের মধ্যেই বড়বাজার বাঙ্গালীর হাতছাড়া হল।

আমাদের চারিত্রিক এই দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে নানাজাতির মধ্যে অন্তর্বিবাহ চালু হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ইংলন্ডে জাতপাত নেই এমন কি মুসলমানের মধ্যেও জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা এসব নেই। সেখানে রয়েছে সাম্যভাব।

আজ যেমন মন্দার ধাক্কায় পৃথিবীর বাজার টলটলায়মান তেমনি মন্দা হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সময়ে পৃথিবীতে যাতে আমেরিকা ইউরোপের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের নানা দেশের মানুষেকে নানা বুভুক্ষা এবং বেকারত্বের জ্বালায় ভুগতে হয়। সে সময়ে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়েছে ইউরোপে। আর সেই সুযোগে ইংলন্ড ভারতবর্ষের বুকে এক চরম আর্থিক শোষণ চালায়। সে সময়ে সুয়েজ খালে যানবাহন চলাচল শুরু হওয়ায় ইংল্যান্ড থেকে লিভারপুল, বোম্বাই-কোলকাতা অনেক কাছে হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

যে বাংলাদেশে আগে ঘরে ঘরে কুটির শিল্প ছিল, চরকার সুতো কেটে তাঁতী মোটা কাপড় বুনত, চাষী নানা ফসল ফলাতো, নদীতে নৌকো স্টীমার চলত, গৃহস্ত ধান ভানতো, পাটকলে মজুর কাজ করত, ধান কলে মেয়েরা কাজ করত, ইংরেজ সরকার বিদেশের উৎপাদিত জিনিসের আমদানীতে উৎসাহ দিয়ে তাকে দেশীয় শিল্প রক্ষায় কোনরূপ বিধিব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রকৃতপক্ষে দেশীয় উৎপাদিত হস্তশিল্প কুটিরশিল্পকে বিপর্যস্ত করে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল। যে তাঁতী মোটা কাপড় বুনত— তা বিদেশী মিলের কাপড়ের আমদানীতে ধীরে ধীরে বন্ধ হল, কারণ মানুষ সস্তায় কাপড় পাচ্ছে। ফলে ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ মানুষের চরকা বন্ধ হয়ে গেল, তাঁতীরও কাজ বন্ধ হল। আগে দেশে পাট চাষ করে তা থেকে চট, পাটের নানা শীত বস্ত্র তৈরি হত। বিদেশ থেকে কম্বল আসতে ধীরে ধীরে পাটের তৈরি শীতনিবারণের সামগ্রী বন্ধ হল। ফলে বহু মানুষ কাজ হারালো বিদেশী দ্রব্য আমদানী হতে। আগে ঘরে ঘরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে গৃহস্থেরা ধান থেকে চাল তৈরী করে বহু আয় করত। কিন্তু ধানকল, চালকল স্থাপিত হতে সেই শিল্পও বিপর্যস্ত হল। আখের রস থেকে গুড়, চিনি তৈরি হত কিন্তু জাভা থেকে চিনি আমদানী হতে ধীরে ধীরে এই শিল্পও বিপর্যস্ত হল। আমাদের দেশের কাঁচামাল সস্তায় কিনে নিয়ে তাদের দেশে তৈরী করে তা এখানে আমদানী করে আমাদের বহু শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংস করেছে। ইংরেজের এমনি বহু আর্থিক শোষণের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর 'জীবনচরিত'-এ।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে নয় বছর পর্যন্ত গ্রামের বিদালয়ে পড়ে ১৮৭০ সালে কলকাতায় ঝামাপুকুর লেনের ভাড়া বাড়িতে বাস করে হেয়ার স্কুলে এসে ভর্ত্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়ে রক্তআমাশায় ভুগে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বাধ্য হন। সেই অবসরে তিনি তাঁদের বাড়িতে পাঠাগারের বিভিন্ন বিষয়ের বই, নানা পত্রপত্রিকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইতিহাস, সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনেক জান অর্জন করে দু বছর পরে কলকাতায় এসে এ্যালবার্ট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এই স্কুলটি কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রে ব্রাহ্ম সমাজের লোকেদের এবং সেই সংস্থার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। তিনি তাদের কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

যদিও প্রফুল্লচন্দ্র ইতিহাস ও সাহিত্যের অনুরাগী তবু তাঁকে 'সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করিতে হইল। বিজ্ঞান একজন নিঃসংশয় একনিষ্ঠ সেবককে চাহিল।

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে পণ্ডিত ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়ে ফাস্ট ক্লাসে পড়বার সময়ে রসায়ন এবং বি এ পড়বার সময়ে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন নিয়ে পড়েন। তিনি বাইরের ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়ে মিঃ (স্যার আলেকজান্ডার) পেডলারের বক্তৃতা শুনতেন এবং অজ্ঞাতসারে রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। নিজে সহপাঠীর বাড়িতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতেন।

সে সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। পিতার ব্যবসার দেনা মেটাতে তাঁর মা অশ্রুমোচন করে একে একে নিজের অলংকার তাঁকে দিচ্ছেন বিক্রী করতে। এরই মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র বাড়ীতে না জানিয়ে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে তাতে কৃতকার্য হয়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন নিয়ে পড়াশুনা করবার জন্য যান। সেখানে গিয়ে রসায়নে ডি এস সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়ে ইউরোপে ৬ বছর থেকে ভারতে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ২৫০ টাকা বেতনে কাজে যোগদান করলেন। এখানেও ইংরেজের বিভেদনীতি এবং আর্থিক শোষণ। কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক তাদের জন্য ইম্পিরিয়াল আর ইরেজ বাদে এদেশীয়দের জন্য প্রভিন্সিয়াল বেতন পাঠান অর্থাৎ এদেশের অধ্যাপকদের অনেক কম বেতন। যোগ্যতা এখানে বিচার্য নয় এমনি বৈষম্য ইংরেজদের শিক্ষানীতিতে যার বিরুদ্ধে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র সহ অনেক অধ্যাপকই লড়াই করেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক। শিক্ষক হয়ে তিনি ল্যাবরেটারীতে গবেষণার কাজকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করেন। যারা রাসায়ন শিখেছেন তাদের পড়াকে আকর্ষণীয় এবং বোধগম্য করার জন্য তিনি এক্সপেরিমেন্ট এমনভাবে সাজাতেন যে ছাত্ররা একাজে খুবই উৎসাহ বোধ করতেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ পড়াতেন না। তিনি ছাত্রদের তার বক্তৃতা অনুসরণ করতে বলতেন।

তিনি অবসর সময়ে গবেষণা কার্য করতে লাগলেন সরষের তেল, ঘি এতে কতটা ভেজাল, খাঁটি তেল ঘি যেমন এসবের পরীক্ষার ফলাফল তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে জার্নালে প্রকাশ করলেন।

শিক্ষা বিভাগে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় অধ্যাপকদের যে পার্থক্য ছিল বহু বার প্রতিবাদের পর তা পুনর্গঠিত হলে প্রফুল্লচন্দ্রকে সিনিয়র অফিসার গ্রেডে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষপদে বদলী করতে চাইলে তিনি তাঁর বিজ্ঞানের গবেষণার

জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজেই জুনিয়র অধ্যাপক হিসেবেই থেকে যান। তার সঙ্গে বৃত্তি - প্রাপ্ত একজন সহকারী থাকতেন। এভাবে যথাক্রমে যতীন্দ্রনাথ সেন, অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, এঁরা পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯০৯ সালে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এঁরা হলেন জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এবং পুলিনবিহারী সরকার— আই এস সি ক্লাসে ভর্তি হন। রসিকলাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হন। মেঘনাদ সাহা ঢাকা কলেজ থেকে আই এস সি উত্তীর্ণ হয়ে এখানে এসে ভর্ত্তি হন। সকলেই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের সুক্ষ্ম আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত হল। প্রফুল্লচন্দ্র এদের হস্টেলে প্রায়ই যেতেন। তিনি এভাবে একটি স্কুল অব কেমিস্ট্রি বা 'রসায়ন গোষ্ঠী' গড়ে তুলতে সমর্থ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সে সময়ে বিদেশে অবস্থানকারী প্রফুল্লচন্দ্রকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি অধ্যাপকের পদের সৃষ্টি করা গেছে। প্রফুল্লচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়ন অধ্যাপকের পদে যোগদানের আহ্বান জানালেন। প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দান করবেন ঠিক করলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিদায়ের দিন ছাত্ররা সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন 'আপনি চিরদিনই আমাদের বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শক।' ''যখন ভারতের বর্তমান যুগের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাস লেখা হইবে, তখন ভারতে নব্য রসায়নী বিদ্যার প্রবর্তকরূপে আপনার নাম সর্বাগ্রে সগৌরবে উল্লিখিত হইবে। এদেশে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্মদাতা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবের জন্মদাতা রূপে যশ ও গৌরব আপনারই প্রাপ্য।''

স্কুলের ছাত্র থেকে অধ্যাপক পদ নিয়ে তিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে অতিবাহিত করেছেন। তাই তাঁর ইচ্ছা, মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্মের এক কণা যেন এই পবিত্রভূমির কোন স্থানে রক্ষিত থাকে।

১৯১৬ সালের পুজোর ছুটির পর প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করলেন। আর তাঁর ছাত্র জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, মেঘনাথ সাহা, সত্যেন বসু প্রত্যেককেই সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দিতে বললেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র অজৈব রসায়ণের ভার নিলেন আর তাঁর সহকমী অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র জৈব রসায়নের ভার নিলেন।

সে সময়ে বিজান কলেজে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে গবেষণার কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করা যেত না, আর আইনজীবী স্যার তারকনাথ পালিত মৃত্যুর আগে বিজ্ঞান কলেজকে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। অন্য আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দেড়লক্ষ পাউন্ড দান করেন। ভারতীয়দের নিকট থেকে দানও পাওয়া গেছে সে দানের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ঘোষ ও পালিতের শর্ত অনুযায়ী বৃত্তির টাকা মূলধন খরচ করবার উপায় ছিল না। যে সব যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়েই প্রফুল্লচন্দ্ররা কাজ শুরু করলেন। সরকার এই কলেজকে সাহায্য করতে কাপর্ণ্য করত। কারণ ঘোষ-পালিত শর্ত অনুযায়ী এখানে ভারতীয় বাদে ইংরেজরা এতে অধ্যাপানার কাজে যুক্ত হতে পারতেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন ছিল। ইংরেজ সরকার এর কোন কোন কলেজকে রাজদ্রোহের আগার বলে মনে করতেন। আর পাশাপাশি দক্ষিণ ভাবতের ব্যাঙ্গালোর এবং পশ্চিম ভারতের বোম্বাইয়ের বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান দুটিতে ইংরেজ সরকারের পুরো কর্তৃত্ব এবং অধ্যাপক তাঁরাই থাকায় সেকানে তাদের সাহায্যের কার্পণ্য ছিল না। তাদের মূলধন ছিল প্রচুর। স্বাধীনচেতা কলকাতা নিজেদের যা সম্বল ছিল তাই দিয়েই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রণালী নির্ধারণ করতে লাগলেন। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী ও ফিজিক্স বিভাগে কার্যত কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। কাসিমবাজারের মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর বহরমপুরস্থিত নিজের কলেজে পদার্থবিদ্যার 'অনার্স কোর্স' খুলবার জন্য কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন— অনার্স খোলার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলে সেই যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান কলেজকে দান করেন। অন্যান্য জায়গা থেকেও কিছু যন্ত্রপাতি ধার করা হল। এই অবস্থায় যন্ত্রপাতির অভাবে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির রাশিকৃত বই এবং পত্রিকা নিয়ে পড়াশুনা করে জ্ঞান ঘোষ, বিখ্যাত 'Ghoses Law' বা 'ঘোষের নিয়ম' আবিষ্কার করেন। মেঘনাদ সাহা গণিত ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করে ছিলেন। নানা পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিখ্যাত Sahas Equations আবিষ্কার করেন।

বিজ্ঞান কলেজে তার ছাত্রদের পরীক্ষা ফি থেকে বাঁচিয়ে ২৪ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য দান যা আগে বলা হল তার সঙ্গে খয়রার রাজার দানের অর্থে ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি এবং বেতার টেলিগ্রাফী বিদ্যার অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যবসায়ী বণিক, শিক্ষিত সমাজ, শ্রেষ্ঠ আইনজীবী প্রভৃতি যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যাগ্রহণ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তাঁদের অর্থ দান না করে সিন্দুক ভরে রাখার দুর্ভাগ্যের কথা আক্ষেপের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি মানুষের সময়ের সদ্ব্যবহারের সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন অসল গল্পগুজব আড্ডা প্রভৃতির মাধ্যমে সময়কে বধ না করে 'মানুষ যদি ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে তবে দশগুণ বেশি কাজ করতে পারে। 'যদি কেহ নিজের নির্দ্দিষ্ট সময়তালিকা অনুসারে কাজ করে, তবে কত বেশী কাজ করতে পারে।'

বইপড়া সম্পর্কে তিনি বলেন, যারা যে বই হাতের কাছে পায় তাই পড়ে এতে মানসিক উন্নতি হয় না। অধিকাংশ সময় কেবল উপন্যাসই পড়লে, গভীর বিষয় অধ্যয়ন করবার শক্তি হ্রাস পায়।

প্রত্যেকের জীবনেই রুচি অনুযায়ী hobby থাকা চাই। তিনি এও বলেন, 'আমরা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে যাহারা অলস যাহাদের শৃঙ্খলা নাই, তাহারাই কেবল দৈনন্দিন কাজে বা জরুরী কাজের জন্য সময়ের অভাবের কথা বলে।'

তিনি ১৯২১-২৬ এই ক'বছর দেশের সর্বত্র ঘুরে জাতীয় বিদ্যালয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, খদ্দর প্রচল এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য প্রচার কার্য চালান। এই সময়ে দেশের খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতারা কারাগারে অবরুদ্ধ হলে তাঁকে কোন কোন জেলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়। তিনি বলেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের যখন পূর্ণবেগ, সেই সময়ে আমি বলি বিজ্ঞান অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করিতে পারে না।'

প্রফুল্লচন্দ্র খুলনা, সুন্দরবনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাতে সাড়া মেলে। তিনি দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যার কাজেও অনুরূপ ভাবে এগিয়ে আসেন। রেললাইন পাতার ফলেই উত্তরবঙ্গে জলনিষ্কাশনের অভাবে বন্যার সৃষ্টি এ বুঝতে পারেন। বিজান কলেজের প্রশস্ত গৃহে বন্যার সাহায্য সমিতির অফিস করা হল। বহু স্বেচ্ছাসেবক এই বন্যার ত্রাণকাজে নিয়োজিত হন।

প্রফুল্লচন্দ্র বালক বয়সে মাতৃভাষায় মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। তাঁর মতে আমাদের দেশের বালকদের ৫/৬ বছর বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। কেননা ঐ ভাষার মধ্য দিয়েই তাকে অন্যান্য বিষয় ও ভাষা শিখতে হয়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ অস্বাভাবিক ও ঘোর অনিষ্টকর ব্যবস্থা নেই। মাতৃভাষাই সব সময় শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন ইতিহাস, বীজগণিত, জ্যামিতি, ভূগোল পাটিগণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রাথমিক বিজান ও অর্থনীতি বাংলাভাষার মধ্য দিয়ে শেখা যেতে পারে। ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে রাখা উচিত। যারা পণ্ডিত হতে চান তারা কেবল শুধু ইংরেজী নয়, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ভাষা শিখবে। তিনি এও বলেন আমাদের পূর্বপুরুষরাই ১৮৪৪ সালের সভায় ইংরেজী না শিক্ষা করিলে শিক্ষিত বলে গণ্য হবে না এমনি সিদ্ধান্তে আসেন ফ্রিচার্চ ইনস্টিটিউশন হলের একটি সভায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময় ১২ থেকে ১৪ বছর থেকে কেননা এর মধ্যে তারা মাতৃভাষা আয়ত্ত করে ফেলে।

ইউরোপীয়রা শুধু উৎপাদেনর মাধ্যমে নানা যন্ত্র আবিষ্কার করে কলকারখানার উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষকে নানাভাবে শোষণই করে না— বর্তমান যুগের কলকারখানা জনগনের ধনিকের স্বার্থের জন্য সহস্র সহস্র লোকের কিরুপে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে তার কথাও শুনিয়েছেন নিউ ইয়র্কের বিচারপতির কথা উদ্ধৃত করে। আমি কেবল মানব সমাজের একাংশের জন্য কাজ ও জীবিকা চাই না, সমগ্র মানব - সমাজের জন্য চাই।... ''বর্তমানে যন্ত্রের সহায়তার মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে। এই মুষ্টিমেয় লোকের কর্মের প্রেরণা মানবপ্রীতি নয়, লোভ ও লালসা।''

একদিকে বড় বড় শহরের আকাশচুম্বী হর্ম্য—যার বিলাস স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলেছেন অপরদিকে সাঁতসেঁতে জনবহুল বস্তির, অন্ধকারময় ঘর, অস্বাস্থ্যকর পল্লী এও তাদের কীর্তি এ নিউইয়র্কের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ওয়েসলি - ও হাওয়ার্ড যা বলেছেন তাই সকলকে অবহিত করেছেন। বিচারপতি আরও জানিয়েছেন যে ধনতন্ত্রের উন্মত্ততা কত দূর চরমে উঠেছে তার নিদর্শন দেশে প্রচুর কাঁচামাল থাকলেও মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত, না খেয়ে মরছে, গম গুদামে পচছে, চিনি ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে।

গ্রাম বাংলার আর্থিক বিপর্যয় এবং কলকারাখানা নির্ভর শিল্পের আমদানীতে গ্রামবাংলার আমোদ প্রমোদ সাংস্কৃতিক জীবন ও পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রফুল্লচন্দ্র এরই মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লেখেন দুই খণ্ডে। মার্কিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার করেন। তাঁর চরিত কথা গ্রন্থে এমনি বহু ইতিহাস এবং তাঁর ভাবনার কথা আমরা জানতে পারি।

একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, ছাত্রদের বিজান চর্চায় উৎসাহ দান, দেশসেবা, নানা শিল্প গড়া বা তার কর্মের সঙ্গে অংশীদার হওয়া এরই মাঝে কিন্তু তাঁর অধ্যয়ন এবং নানা বিষয়ে লেখা নিরন্তর ধারায় চলছে। তিনি ইংরেজী ৪৪টির মত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ অভিভাষণ ইত্যাদি লিখেছেন, গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, বাংলা ভাষায় করেছেন এমনি প্রবন্ধ, অভিভাষণ এবং গ্রন্থ রচনা যার মোট সংখ্যা ৫৮। তিন খণ্ডে রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাঁর।

এই কর্মযোগী মনীষী অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও অধ্যাপনার সারা জীবনে সঞ্চিত অর্থ তিনি রসায়ন শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। নিজে শেষজীবনে বিজ্ঞান কলেজের একটি ছোট্ট ঘরে বাস করে ১৯৪৪ সালের১৬ই জুন তিরাশি বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।